উইলিয়াম ডালরিম্পলের বই, ১৮৫৭’র লড়াই এবং সমকালীন সাম্রাজ্যবাদ (পর্ব-১)

ফাহমিদ-উর-রহমান

সঞ্চারণ
ঐতিহ্যের অনুরণন

প্রথম পর্বঃ উইলিয়াম ডালরিম্পলের বই, ১৮৫৭’র লড়াই এবং সমকালীন সাম্রাজ্যবাদ

৪

১৮৫৭’র বিপ্লবের একাধিক কারণ আলোচিত হয়েছে এবং ঐতিহাসিকরা তাদের নিজের দৃষ্টিভঙ্গি মিলিয়ে সেসবের বিচার করার চেষ্টা করেছেন। তবে শেষ পর্যন্ত এটি যে বিদেশী আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে আজাদীর লড়াই ছিল সে সম্বন্ধে দেশপ্রেমিক মানুষের মনে কোন সন্দেহ থাকার কথা নয়। বৃটিশরা শুধু নিষ্ঠুর সাম্রাজ্যবাদীই ছিল না, ওরা একই সাথে ছিল ক্রুসেডার ও সাম্প্রদায়িক। স্পেনে মুসলিম শাসন অবসানের পর রাণী ইসাবেলা কলম্বাসের নেতৃত্বে যে সমুদ্রাভিযান শুরু করেছিলেন তার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল লুণ্ঠনের পাশাপাশি খৃস্ট ধর্মের বিজয় ডঙ্কা এগিয়ে নেয়া। এরপর ইউরোপ থেকে এশিয়া-আফিকার দিকে দলে দলে অভিযানকারীরা ছুটে এসেছে সমরূপ চিন্তা-ভাবনা নিয়েই। পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের সাথে খৃষ্ট ধর্মের সম্পর্ক গভীর এবং ইতিহাসে পরসস্পরের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। জেমো কেনিয়াত্তার সেই বিখ্যাত উক্তিটি আমরা মনে করতে পারিঃ When the Europeans came to Africa, Europeans had the Bible in their hands and the Africans lands in their hands. Europeans asked Africans to close their eyes and pray; when they opened their eyes the Africans had the Bible in their hands and the lands in the hands of the Europeans.

> এ দেশে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী বণিকরা যখন আসে তখন তার সঙ্গী হয়ে আসে খৃস্টান মিশনারীরা। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর এজেন্ডা ছিল ভারতবর্ষ লুণ্ঠনের পাশাপাশি খৃস্ট ধর্ম প্রচার করা। এসব মিশনারীদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন ইংরেজ রাজ কর্মচারীরা। অনেক রাজকর্মচারী মনে করতেন ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যই হচ্ছে খৃস্ট ধর্মকে ভারতবর্ষে শক্তিশালী ও পরমন্ত করে তোলা। লর্ড সলিসবেরি বলেছিলেন, ভারতীয়দের সবাইকে খৃস্ট ধর্মে দীক্ষিত করা হয়নি বলেই সিপাহী বিদ্রোহের মত ঘটনা ঘটে। সেক্যুলার ইউরোপের অদ্ভুত চেহারায় নয় কি? মিশনারীরা হচ্ছে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের অগ্রবাহিনী। প্রথমে তারা কোথাও এসে হাজীর হয়, শান্তির কথা বলে, পরে সেখানে একটা মজবুত ভিত্তি ও ভাবমূর্তি প্রস্তুত হলে সাম্রাজ্যবাদ সশরীরে আবির্ভূত হয়। ভারতবর্ষে সাতশ’ বছর মুসলমানরা শাসন করেছিল কিন্তু জোর করে ধর্মান্তরের কোন ঘটনা ঘটেনি। এ রকম হলে ভারতবর্ষের জনসংখ্যার প্রধান অংশ হিন্দু থাকতে পারতো না। ঔপনিবেশিক শাসনে হিন্দু ও মুসলমান যুগপৎভাবে স্বধর্ম হারানোর ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। আমাদের মুন্সী মেহেরুল্লাহ দীর্ঘদিন ধরে এই সাম্রাজ্যবাদী মিশনারীদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন সে কথা আমরা জানি। ইতিহাসের গতিতেই মুন্সী মেহেরুল্লাহর মত মানুষেরা সেদিন দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন।

১৮৫৭’র বিপ্লবের পিছনে তাই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কারণ যেমন আছে তেমনি আছে ধর্মীয় কারণ। সেদিন এই অভ্যুত্থান না হলে ভারতবর্ষের ভাগ্য হয়তো অন্য রকম লেখা হতো- এটি একটি স্পেন বা ফিলিপাইনের মতো খৃষ্টান দেশে পরিণত হতো।

বৃটিশরা শুধু জোর করে ধর্ম প্রচার করার চেষ্টাই করেননি, তারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে এ দেশের সমাজ ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে চুরে ফেরতে উদ্যত হয়, তেমনি নিষ্ঠুরভাবে খাজনা আদায় করে জনগণকে পথে বসায়। এই খাজনা আদয়ের প্রকৃতি এতই নিষ্ঠুর ছিল যে, তার ফলশ্রুতিতে ৭৬র মন্বন্তরের মত দুর্বিষহ ঘটনা ঘটে। একদিকে জোর করে খাজনা আদায়, অন্যদিকে দেশীয় শিল্প, বাণিজ্য ধ্বংস করে ভারতবর্ষকে বৃটিশের বাজারে পরিণত করে সাধারণ মানুষের দুর্দশাকে সীমাহীন করে তোলা হয়। এইভাবে খাজনা আদায় থেকে শুরু করে যত প্রকার অত্যাচার-অবিচার সম্ভব ইংরেজা দেশের মানুষের উপর নির্বিবাদে চালিয়ে যায়। ফলে ইংরেজের উপর তাদের ক্ষোভ ধূমায়িত হয়ে ওঠে। অন্যদিকে দেশীয় রাজা ও নওয়াবরাও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নানা অজুহাতে তাদের রাজ্যগুলো গ্রাস করার কূটচালে অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে। এমনি করে ১৮৫৭র পরিস্থিতি যখন উপস্থিত হয় তখন রাজা-প্রজা নির্বিশেষে সকলে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ে এবং গোলামীর বন্ধন কাটবার জন্য সবাই একত্র হয়।

৫

বাংলা ভাষীদের মধ্যে ১৮৫৭র বিপ্লবী ঘটনা নিয়ে ভুলে বুঝাবুঝির একটা কারণ অবশ্যই ইংরেজদের অপ্রচার। কিন্তু তার চেয়ে ভয়াবহ কারণ হচ্ছে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এদেশে একটি দাসসুলভ, সুবিধাবাদী মধ্যবিত্ত শ্রেণী সৃষ্টি করতে সমর্থ হয় ইংরেজরা। এদের ১৮৫৭র স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি কোন সহানুভূতি ছিল না। বৃটিশ শাসনের সুবাদে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী সেদিন কলকাতাকে কেন্দ্র করে বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব দেয়ায় তারা নির্বিচারে ১৮৫৭র মত বিপ্লবী ঘটনাকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা করে। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী একদিকে যেমন ছিল বৃটিশ অনুগত, অন্যদিকে সাম্প্রদায়িক ও মুসলমানবিদ্বেষী। এরা পশ্চিমা জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্ভাবনা আঁচ করতে পারলেও ভারতবর্ষের মুক্তির জন্য ধর্ম নির্বিশেষে জাতীয় ঐক্যের কথা ভাবতে পারেননি এবং সত্যিকার অর্থে দেশের জনজীবন থেকে তারা ছিলেন বিচ্ছিন্ন। বৃটিশের কলোনি বিস্তারে এরা ছিলেন বিশ্বস্ত সহায়ক শক্তি। এরাই ইংরেজের ভারত জয়কে ভগবানের মঙ্গলময় বিধান এবং ইংরেজ শাসনকে ঈশ্বরের শাসন হিসেবে প্রত্যয়নপত্র দিয়েছিলেন। ১৮৫৭র অভ্যুত্থানের সময় কলকাতাকেন্দ্রিক ইংরেজী শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী ও জমিদার শ্রেণীর ভূমিকাকে দাসত্ববৃত্তির নিকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হিসেবেই উল্লেখ করা যায়। এদের ভূমিকার সাথে মীর জাফরের ভূমিকার কোন তফাৎ নেই।

ইংরেজের উপর ভরসা করেই এই মধ্যবিত্ত কলকাতায় বাংলার রেনেসাঁর জন্ম দিয়েছিল। ইংরেজরও সহযোগিতা দিয়েছিল যাতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আনুগত্য ধরে রাখা যায়। যুদ্ধের সময় হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সহযোগিতার পুরস্কারস্বরূপ বৃটিশরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিল।

> নামে বাংলার রেনেসাঁস হলেও এটা ছিল মূলত হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদের উৎকৃষ্ট নমুনা। এই পুনরুজ্জীবনবাদের পথ ধরেই তথাকথিত বাংলার রেনেসাঁর পুরোধারা হিন্দু জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটান কালে যা সর্বভারতীয় বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, ঈশ্বর গুপ্ত, নবীন সেনদের জাতীয়তাবাদ সেকুলার ছিল না। সঙ্গত কারণেই তাদের কর্মযজ্ঞ অসাম্প্রদায়িক ও বৃটিশবিরোধী হতে পারেনি। এই হিন্দু রেনেসাঁর শ্রেষ্ঠতম রত্ন রবীন্দ্রনাথও বৃটিশ শাসককে শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের শাসনের বাইরে অন্য কিছু ভাবতে পারেননি। কলোনি বিস্তারের এমন বিচিত্র ব্যাখ্যায় কৌতুক বোধ করা ছাড়া আমাদের উপায় নেই। বৃটিশের সহযোগিতায় কলকাতায় সাম্প্রদায়িকতার যে বিষফল রোপিত হয়েছিল তাই কালে কালে মহীরুহে পরিণত হয় এবং ভারতবর্ষ জুড়ে দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে। মনে রাখা দরকার মিঃ জিন্নাহ ও মুসলিম লীগের জাতীয়তাবাদের বিকাশ একদিনে ঘটেনি। আনন্দ মঠের অভীষ্ঠ জাতীয়তাবাদের প্রতিক্রিয়ায় তৈরি হয় মুসলিম জাতীয়তাবাদ সে কথা যেন আমরা ভুলে না যাই। আজকাল বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের নামে নানা রকম সমন্বয় পন্থার কথা শোনা যায় কিন্তু আনন্দ মঠের জাতীয়তাবাদে এর আদৌ কোন স্থান ছিল কি? এই রকম সাম্প্রদায়িকতার তোড়ে একদিন ভারতবর্ষই দুটুকরো হয়ে যায়। হয়তো বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অভীষ্ঠও ছিল তাই।

১৮৫৭ সালে বঙ্কিমচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র, নবীন সেন, ঈশ্চরন্দ্র বিদ্যাসাগর ও তাদের সমগোত্রীয়রা এ লড়াইকে সমর্থন করেননি। কারণ তারা মনে করেছিলেন এতে আবার মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। মহাবিদ্রোহের সমর্থনে ও মুসলিমবিরোধিতায় এ শ্রেণীর লেখালেখি, বক্তৃতা-বিবৃতি রীতিমত লজ্জাজনক। সাম্প্রদায়িকতা যে চিন্তাশীল মানুষদেরও কতখানি কলুষিত করে দেয় এ তার বড় প্রমাণ। মুসলিমবিদ্বেষ, বৃটিশের দালালি ও সাম্প্রদায়িকতা যেন এক সাথে গলাগলি করছে!

একটা উদাহরণ নেয়া যাকঃ একেবারে মারা যায় যত চাঁপ দেড়ে (দাড়িওয়ালা)। হাঁসফাঁস করে যত প্যাঁজখোর নেড়ে।। বিশেষতঃ

পাকা দাড়ি পেট মোটা ভুঁড়ে।। রৌদ্র গিয়া পেটে ঢোকে নেড়া মাথা ফুঁড়ে। কাজি কোল্লা মিয়া মোল্লা দাঁড়িপাল্লা ধরি।। কাছা খোল্লা তোবাতাল্লা বলে আল্লাহ মরি। (ঈশ্বর গুপ্ত)

এই সাম্প্রদায়িকতার পরিণাম যে ভারতবর্ষের ইতিহাসে মোটেই প্রীতিকর হয়নি তাতো ইতিহাস অনুরাগী পাঠকবৃন্দের জানা। ভারতবর্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সবচেয়ে বড় অবদান যে এই সাম্প্রদায়িকতা তা বলাই বাহুল্য।

৬

১৮৫৭য় দিল্লী, লাখনৌ, মিরাট, বুন্দেলখণ্ডে যা ঘটেছে আজ তার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে বাগদাদ, বসরা, কাবুল, কান্দাহারে। সাম্রাজ্যবাদের মুখোশ পরিবর্তন হয়েছে, চরিত্রের পরিবর্তন হয়নি। সেদিন বৃটিশরা ভারতবর্ষে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল লুণ্ঠন করতে, খৃষ্ট ধর্ম প্রচার করতে আর স্বাধীনতা কেড়ে নিতে। একালে তাদের জায়গায় আমেরিকা বসেছে। এরা ইরাকে, আফগানিস্তানে, হানা দিয়েছে একইভাবে লুণ্ঠন করতে, স্বাধীনতা কেড়ে নিতে আর খৃস্ট ধর্মের জয়ডঙ্কা বাজাতে। প্রেসিডেন্ট বুশ বরেছেন, তিনি যীশুর প্রেরণায় ক্রুসেডে নেমেছেন। তবে হানাদাররা সারা দুনিয়াকে যতই বোকা বানাবার চেষ্টা করুক না কেন, ঔপনিবেশিক যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত ঔপনিবেশিক যুদ্ধ বলেই ধরা পড়বে।

লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে, সেকালের মত একালেও সাম্রাজ্যবাদের দাস আর গোলামের কোন অভাব হয়নি। সেকালের মত একালেও সুশীল সমাজ আছে যারা মোটেই তখনকার তুলনায় সাম্রাজ্যবাদের কম গুনগান করছে না। চিরকালই পশ্চিমা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী উদার নীতির মুখোশ পরে সাম্রাজ্যবাদের দালালি ও মোসাহেবী করে। ১৮৫৭র বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে যারা সেদিন দাঁড়িয়েছিল, তাদের বক্তব্য বিবৃতির সাথে আজকের দিনের সাম্রাজ্যবাদী সমর্থকদের মতামতের কি আশ্চর্য মিল এবং যুগপৎভাবে তা অশ্লীল ও হাস্যকর। ১৮৫৭ আমাদের জন্য একটা পথের দিশা রেখে গিয়েছিল। সেটি পুরোপুরি সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদবিরোধী। কোন সন্দেহ নেই আজও মানব জাতির প্রধান সংকট সাম্রাজ্যবাদ এবং তার থেকে মুক্তির জন্য ১৮৫৭র শিক্ষা সমান গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৫৭র বিপ্লব পরাস্ত হয়েছিল, তার অনেক কারণ ছিল, দুর্বল নেতৃত্ব, দুর্বল সাংগঠনিক ভিত্তি, অসমন্বিত পরিকল্পনা, প্রাযুক্তিক অনগ্রসরতা প্রত্যেকটি ১৮৫৭র বিপর্যয়ের জন্য দায়ী। তারপরও বলতে হবে ১৮৫৭র চেতনা সাম্রাজ্যবাদ উৎখাতের সংগ্রামে অনন্ত প্রেরণা হয়ে আছে।

১৮৫৭র সার্ধ শতবার্ষিকীতে ডালরিম্পলের বই পড়বার পর মনে হয়েছে সাম্রাজ্যবাদের ঔচিত্য প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি উনিশ শতকের গোলাম বুদ্ধিজীবীদের ভাষণকে পরিহার করে শোভন, সজ্জন ও শরীফ ভদ্রলোকদের মেজাজ ও যুক্তিকে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তাতে কি সাম্রাজ্যবাদের ঔচিত্য ভাঙ্গবার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে? এর একটাই উত্তর, না।

সূত্রঃ বদ্বীপ প্রকাশন প্রকাশিত মহাবিদ্রোহ ১৮৫৭ গ্রন্থ

ফাহমিদ-উর-রহমান

ফাহমিদ-উর-রহমান একজন মননশীল প্রাবন্ধিক ও বুদ্ধিজীবী। পেশায় মনোরোগ বিশেষজ্ঞ হলেও ইতিহাস, সংস্কৃতি, ধর্ম, সমাজ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তিনি লিখছেন। সমাজ ও সংস্কৃতি সচেতন বিধায় তিনি আধুনিকতার সমস্যা নিয়ে লিখেছেন। আধুনিকতা ও সাম্রাজ্যবাদের সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ নিয়েও তিনি কথা বলেছেন। তার ঋদ্ধ লেখালেখি নতুন আঙ্গিকে বাঙালি মুসলমানের জাতিসত্তার উপরে আলোকপাত করেছে। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের নামঃ ১। ইকবাল মননে অন্বেষণে (১৯৯৫) ২। অন্য আলোয় দেখা (২০০২) ৩। উত্তর আধুনিকতা (২০০৬) ৪। সেকুলারিজমের সত্য মিথ্যা (২০০৮) ৫। উত্তর আধুনিক মুসলিম মন (২০১০) ৬। সাম্রাজ্যবাদ (২০১২) ৭। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ (২০১৩) ৮। সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও বাংলাদেশ (২০১৪) পাশাপাশি তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে ১। জামাল উদ্দীন আফগানী: নব প্রভাতের সূর্য পুরুষ (২০০৩) ২। মহাবিদ্রোহ ১৮৫৭ (২০০৯) ৩। ফরায়েজী আন্দোলন : আত্মসত্তার রাজনীতি (২০১১)